বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ

সাব্বির জাদিদ

ঐতিহ্য

উৎসর্গ

আরিফুর রহমান নাইম
বইবিমুখ বাংলাদেশের ঘরে ঘরে
'নির্বাচিত'
বই পৌঁছে দেয়ার সাধনায় মগ্ন এক শুভ্রকেশী দরবেশ;
আমার মাথার ওপর আপনার
স্নেহের ছায়া দীর্ঘতর হোক।

'আব্বু, তুমি কান্না করতেছ যে!' আমার দ্বিতীয় গল্পবই। এই বইয়ের গল্পগুলো ২০১৫ থেকে ২০২০–এই ছয় বছরের নানা সময়ে লিখিত এবং পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত। গল্পগুলোর বিষয় বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের মানুষ। গল্পগ্রন্থে সচারচর প্রতিটি গল্পের শুরুতে গল্পের নাম দেয়া হয়। কবিতার বইয়েও তাই। কিন্তু এই বইয়ে প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম করা হলো। এই বইয়ের পাঠক আগে গল্প পড়বে তারপর পড়বে গল্পের নাম। অবশ্য অতিকৌতূহলী কেউ যদি গল্পপাঠের আগেই তলায় গিয়ে গল্পের নাম জেনে আসে, তাতে বিশেষ কোনো গোনাহ হবে না।

সাব্বির জাদিদ
১৬ নভেম্বর, ২০২০

গল্পক্রম

আব্বু, তুমি কান্না করতেছ যে! /১১
কেউ কেউ মরে গিয়ে সংখ্যাও হয় না /২০
ভার অথবা নির্ভারের গল্প /২৮
প্রেমের অসুখ /৩৫
স্বস্তিকর দুঃসংবাদ /৪৩
ক্রীতদাস /৪৯
অন্তর্বাস /৫৬
দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে /৬৩
প্রতিদ্বন্দ্বী /৬৯
খিদে /৭৭
ফরিদ ডাক্তারের গল্পকার হয়ে ওঠার গল্প /৮৪
হাঁটতে হাঁটতে ধর্ষিত হওয়া মেয়েটি /৯৩
বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ /৯৯
স্যান্ডেল ও মুরগিছানা /১০৫

রচনাকাল : ১৫ নভেম্বর, ২০২০

এক রোদমরা বিকেলে নবগঙ্গার তীরে হাঁটতে হাঁটতে মহল্লার ইমামের মুখ থেকে এক জাহান্নামির গল্প শুনে আমরা থ হয়ে যাই। তখন রমজান মাস সবে শুরু হয়েছে। আমরা বন্ধুরা নতুন নামাজ ধরেছি। শুধু নামাজ না, মহা ধুমধামের সাথে তারাবি পড়ছি। বিকেল হলে মাথায় জরির কাজ করা নকশাদার টুপি পরে ঘুরে বেড়াই। সন্ধ্যায় খেজুরের ডালের মেসওয়াক করি। এ বছর সবগুলা রোজা রাখার নিয়ত আমাদের।

রোজার মাস বলেই বিকেল থেকে মসজিদের মাইকে গজল বাজতে শুরু করে। আর কী কা-, গজল বাজতেই বটতলায় বহর আলির বেগুনি পেঁয়াজুর দোকানে ভিড় জমে যায়। রোজাদাররা নিম অথবা খেজুর অথবা অন্য কোনো ডালের মেসওয়াক মুখে নিয়ে ব্যস্ত ভঙ্গিতে বাজার থেকে বাড়ি ফেরে। আর আমরা–আমরা বলতে আমি, নাইম, শিবলী ইমাম সাহেবের পেছন পেছন ঘুরি নামাজ-রোজার হাদিস শেখার আশায়। আমাদের চোখেমুখে ইমানের নবীন তেজ দেখে ইমাম সাহেব আমাদেরকে প্রশ্রয় দেন। বিকেলের সংক্ষিপ্ত সময়টা আমাদের সাথে ভাগ করেন। অল্পদিনে আমরা তিন বন্ধু ইমাম সাহেবের সান্নিধ্য লাভে আর সব তরুণ থেকে আলাদা হয়ে উঠি।

সেদিনের বিকেলটা একটু অন্য ধরনের ছিল। শরতের রোদ আসরের আজানের পরপরই বুজে এসেছিল। নবগঙ্গার বুকে শিমুল গাছের প্রতিবিম্ব তিরতিরে ঢেউয়ে দুলছিল। সেই ঢেউয়ের গা ছুঁয়ে ওড়াউড়ি করছিল একটা মাছরাঙা। ইমাম সাহেব হঠাৎ মুখ থেকে জয়তুনের মেসওয়াক বের করে বললেন, তোমাদেরকে আজ এক জাহান্নামির গল্প বলব।

নামাজ-রোজার খটমটো হাদিস শুনতে শুনতে আমাদের তরুণ মনে একঘেয়েমির পলি জমে গিয়েছিল। আজ হঠাৎ গল্পের সুঘ্রাণ পেয়ে–তাও আবার এক জাহান্নামির গল্প–আমরা নড়েচড়ে উঠি। আমাদের পলি পড়া শুষ্ক বুকে উত্তেজনার স্রোত বইতে শুরু করে। আমরা একযোগে ইমাম সাহেবের কুচকুচে কালো দাড়িবিশিষ্ট সৌরভময় মুখের দিকে তাকাই–কী সেই গল্প?

জবাবে আমাদের মসজিদের যুবক ইমাম যার গল্প বলা শুরু করে তাকে আমাদের বড্ড চেনা চেনা লাগে। বিশেষ করে তার উচ্চতা, ঠোঁটের নিচের কাটা দাগ আর নাকের ডগার কালো তিল আমাদেরকে ধন্দে ফেলে দেয়। আমাদের চোখে ভেসে ওঠে রতনের ছবি, যে রতন আমাদের এক ক্লাস উপরে পড়ে। কলেজে সে সেকেন্ড ইয়ারে, আমরা ফার্স্ট। তবে আমরা তখন গল্পের ঘোরে এতটাই বিভোর যে ঘটনার চেয়ে ব্যক্তি মুখ্য হয়ে ওঠে না। ফলে আমরা রতনকে পাত্তা না দিয়ে গল্পের সাথে চলতে থাকি।

রোজ কেয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্যের বিবরণ ইমাম সাহেব এমনভাবে দেন, আমাদের লোম শিউরে ওঠে। আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে আস্ত এক রোজহাশরের মাঠ। যেখানে অসংখ্য নারী পুরুষ নগ্ন দেহে ইয়া নাফসি ইয়া নাফসি করছে। সেই অজস্র নারী পুরুষের ভেতর থেকে আমরা আমাদের শহরতলির রতনকে চিহ্নিত করে ফেলি, যার আমলনামায় জাহান্নামের সিল পড়ে গেছে। জাহান্নামের ঘোষণায় আমাদের চেনা রতন উন্মাদের মতো করতে থাকে আর আমরা খেয়াল করি, বিশাল সূর্য রতনের মাথার ওপর আজরাইলের মতো নেমে এসেছে। সূর্যের চোখ ঝলসানো আলোর দিকে তাকাতে না পারলেও আমরা বুঝতে পারি, রতনের মাথার ঘিলু বলক ওঠা ভাতের মতো টগবগ করে ফুটছে। এই দৃশ্য আমাদের সহ্য হয় না। আমাদের কণ্ঠের গভীর গিরিখাদ থেকে ব্যথার আহ ধ্বনি উচ্চারিত হয়। আমরা সবুজের দিকে চোখ সরিয়ে নিয়ে ইমাম সাহেবের উদ্দেশে বলি, কিন্তু রতনের পাপটা কী? আমরা তো তাকে ভালো ছেলে হিসেবেই জানি।

ইমাম সাহেব এবার জয়তুনের মেসওয়াক সামনের দুই দাঁতের ওপর ঘষতে ঘষতে বলেন, রতন ছেলেটা খারাপ না এবং শেষ বয়সে সে জনতার চোখে বিরাট ধার্মিক হয়ে উঠবে। রিটায়ার্ড করার পর সে আমাদের ছোট্ট মসজিদের জৌলুস ফিরিয়ে আনবে। যদিও এসি-টাইলসের সেই জৌলুস আমি দেখে যেতে পারব না। তবু তার আমলনামায় লেখা হবে জাহান্নাম।

আমরা তিন বন্ধু অবাক বিস্ময়ে সেই আগের প্রশ্নটাই করতে যাই–তার পাপটা কী? কিন্তু গলার গহ্বর থেকে প্রশ্নধ্বনি বের হওয়ার আগেই আবার আমাদের সামনে হাজির হয় রোজহাশর। আমরা দেখি, দিশেহারা রতন সূর্যের আজাব থেকে বাঁচতে সৌরভময় জান্নাতের দিকে ছুটছে আর তার পেছনে মেশিনগান হাতে দাঁড়িয়ে আছে বিশালদেহী এক ফেরেশতা। রতন যখনই জান্নাতের ফটকের কাছাকাছি পৌঁছল, অমনি ফেরেশতার মেশিনগান থেকে শিস কেটে বেরিয়ে এল আগুনের ভয়ঙ্কর বুলেট। রতন মুখ থুবড়ে পড়ে গেল রোজহাশরের রোদে পোড়া তামাটে মাটির ওপর। তার সমস্ত শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল ধুনিত তুলোর মতো। সেই মুহূর্তে রতনের শরীর এবং চোখ যদি অক্ষত থাকত, দেখতে পেত, তার অবস্থানের ঠিক

এক হাত পরেই শুরু হয়েছে জান্নাতের শ্যামলিমা, সবুজ ঘাস।

আমরা তিন বন্ধু রুদ্ধশ্বাসে রতনের ছড়িয়ে পড়া শরীরের একেক অংশের দিকে তাকিয়ে থাকি আর খেয়াল করি, ধীরে ধীরে রতনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মানবাকার ধারণ করছে। বিচ্ছিন্ন অঙ্গগুলো জোড়া লাগার পর দেখা যায়, রতন সেখানে দাঁড়িয়ে আছে, যেখান থেকে একটু আগে সে দৌড় শুরু করেছিল এবং তার পেছনে মেশিনগান তাক করে আছে সেই ফেরেশতা।

ইমাম সাহেব আমাদের শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা দীর্ঘায়িত করবার জন্যই হয়তো বলেন, রতনের এই শাস্তি চলমান থাকবে ততক্ষণ, যতক্ষণ না ফাতেমার আব্বুর জান্নাতের ফয়সালা হয়। এরপর রতনকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

ফাতেমা কে? তার আব্বু কে? এদের সাথে রতনের কী সম্পর্ক? ধৈর্যহারা আমি হড়বড় করে প্রশ্নগুলো করি।

ইমাম সাহেব শীতের নবগঙ্গার মতো শান্ত–ওদের পরিচয় জানার জন্য তোমাদেরকে আরো কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে।

তাহলে বলুন হুজুর, রতনকে কেন শাস্তি দেয়া হবে? কী তার পাপ? এই প্রশ্ন নাইমের।

রতনের পাপ জড়িয়ে আছে তার মাঝ বয়সের জীবনের সাথে, যে জীবন এখনো শুরুই করেনি সে।

আপনি এসব কী করে জানেন?

আমি সবই জানি। খুব নিচু স্বরে কথাটা বলে ইমাম সাহেব আকাশের দিকে তাকান। তার চেহারায় শরতি মেঘের গাম্ভীর্য। আজ তাকে বড্ড অচেনা লাগছে। জাহান্নামির গল্পের নামে তিনি যা বলছেন, আমাদের মতো নবীন নামাজিদের কাছেও তা অবিশ্বাস্য লাগে। কিন্তু তার গলার স্বর, চোখের চাউনি এবং চেহারার ভঙ্গি এতটাই শান্ত এবং স্থির–পুরোপুরি অবিশ্বাসও করতে পারি না। দ্বিধার দোলাচলে দুলতে দুলতে আমরা কখন যে রতনের মধ্যজীবনে প্রবেশ করে ফেলি, টেরও পাই না।

রতন–যার সাথে আমাদের সম্পর্কটা কেবলই দেখা হলে ঘাড় ঝাঁকানোয় সীমাবদ্ধ–নবগঙ্গার পাড়ে বেড়ে ওঠা সেই ছেলেটা সবার চোখের সামনে একদিন পুলিশে ঢুকে যাবে। যেখানে তার বসবাস, ঠাঁট করে একে উপশহর বললেও আদতে এটা গ্রামই। নামের মধ্যেও গ্রামের গন্ধ–বেলগাছি। এই গ্রামের মতো উপশহরের এক প্রান্তে সামান্য ঢেউ উঠলে তার গর্জন শোনা যায় অপর প্রান্ত থেকে। আচমকা রতনের পুলিশ হয়ে ওঠা বেলগাছির যুবকদের ওপর বেশ একটা গর্জনই যেন রেখে যাবে। নাইম শিবলীদের বাবারা আফসোস করে বলবে, তোদের চোখের সামনে রতন বন্দুকঅলা পুলিশ হয়ে গেল, তোরা কী করলি?

রতন শুধু পুলিশই হবে না, দক্ষতা দেখিয়ে একদিন সে কালো র‍্যাব হয়ে বেলগাছির বেকার যুবকদের বুকে হিংসার কাঁটা ফোটাবে। রতন বিয়ে করবে। রতন বাচ্চা তুলবে। রতন বাচ্চাকে স্কুলে ভর্তি করবে। তারপর আসবে মেশিনগানের দিন। র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটলিয়নের বন্দুকের আগায় অস্থির হয়ে উঠবে সন্ত্রাসীরা। নবগঙ্গার পাড়ে বেড়ে ওঠা মাঝবয়সী রতনকে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে নামতে হবে। ক্রসফায়ারে মারা পড়বে চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা।

এমনই অস্থির সময়ে এক অমাবস্যার রাতে কয়েকজন জুনিয়র র‍্যাব সদস্যকে নিয়ে নিঃশব্দ গাড়ির চাকায় বেলগাছিতে প্রবেশ করবে রতন। পুরো বেলগাছি তখন ঘুম। ঘুমের গভীরতায় কারো কারো নাক ডাকবে। কোথাও হুক্কাহুয়া রব তুলবে দলছুট শেয়াল। রাস্তার পাশে পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকা একটা লাল কুকুর তাকিয়ে থাকবে জিপের চোখ ধাঁধানো আলোর দিকে।

স্যার, আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি? রতনের দিকে সামান্য ঘাড় কাত করে জিজ্ঞেস করবে ড্রাইভার।

আসামি ধরতে। সাপের ফণার মতো শীতল কণ্ঠে উত্তর দেবে রতন।

কিন্তু শফিকের বাড়ি তো মধুপুরে। আমরা বেলগাছিতে যাচ্ছি কেন? দ্বিধান্বিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করবে রতনের সহকারী হাবিব।

মধুপুরের শফিক আমার খালু। আমরা আরেক শফিকের কাছে যাচ্ছি।

জুনিয়র হাবিব নিঃশব্দ মুচকি হেসে নিজেকে নিজের ভেতর গুটিয়ে নেবে। স্যারের দুটিমাত্র বাক্যের মর্মার্থ এতটাই খোলাসা, হাবিবকে আর কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে না। র‍্যাবের জিপ এগিয়ে চলবে রাস্তায় দাগ এঁকে এঁকে। ওদিকে শফিক, বেলগাছির শফিক রাতের খাবার খেয়ে মাত্রই ভারী শরীরটা মশারির ভেতর গুঁজতে যাবে, ঠিক তখন গেটের মুখে শোনা যাবে বুটের আওয়াজ। শফিক মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি, তবে বইয়ে পড়েছে এবং সিনেমায় দেখেছে, পাকিস্তানি ঘাতকেরা একাত্তরে এভাবেই মাঝরাতে বুটের আওয়াজ তুলে দরজায় এসে দাঁড়াত। মুক্তিযুদ্ধের কথা স্মরণ হতেই রক্তের মধ্যে ভয় ছলকে উঠবে শফিকের। শফিকের বউ জাহানারা একবার স্বামীকে দেখে নিয়ে দরজার দিকে তাকাবে। ভাববে, এতরাতে আবার কে ডাকে। শফিক কোমরে লুঙ্গি গুঁজতে গুঁজতে বলবে, তুমি শোও, আমি দেখছি। জাহানারা মোবাইল এগিয়ে দিতে দিতে বলবে, বাইরে অন্ধকার। ফোনটা সাথে রাখ। শফিক ঘুমন্ত কন্যার ঘরে উঁকি দিয়ে ফোনের টর্চ জ্বেলে গেটের দিকে এগোবে। এতরাতে কে ডাকে বলতে বলতে সে গেটের হুক খুলবে আর ওপাশ থেকে ভেসে আসবে রতনের সহকারী হাবিবের গলা–আমরা আইনের লোক।

'আইনের লোক' কথাটা কানে যেতেই শফিকের মনে পড়ে যাবে বাজারের দোকানটার কথা। যে দোকান নিয়ে গত তিনমাস ধরে তার মফিজের সাথে ক্যাঁচাল

চলছে। দোকানের দখল নিতে মফিজের ইশারায় কি এই বুটওয়ালাদের আগমন? উত্তেজনায় শফিক গেট ছেড়ে পুরোপুরি বাইরে বেরিয়ে আসবে। এরা কেমন আইনের লোক দেখার জন্য মোবাইলের আলো ওদের মুখের ওপর ধরতে গিয়েও ভদ্রতাবশত কিংবা ভয়বশত শফিক মোবাইলটা হাতের মধ্যে রেখে দেবে। শফিক খেয়াল করবে, এদের লিডার একটুখানি দূরে গায়ের সাথে অন্ধকার জড়িয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অমাবস্যার কালো রাতের সাথে তার কালো পোশাক মিলেমিশে একাকার। শফিক ভয় তাড়িয়ে শক্ত গলায় কমান্ডারের উদ্দেশে বলবে, আপনারা কারা? এতরাতে আমার কাছে কী চান?

জবাবে লিডার কিছু বলবে না। সে শফিকের থেকে মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে রাখবে। আর তখন রতনের সহকারী হাবিবকে দেখা যাবে দুটো বই হাতে শফিকের গেট থেকে বেরোচ্ছে। বই দুটো সে স্যারের দিকে এগিয়ে বলবে, স্যার, এর বাড়িতে জিহাদি বই পাওয়া গেছে।

স্যার ধমক মেরে বলবে, হারামজাদা, এটা জিহাদি বইয়ের কেস না। আসল জিনিস খোঁজ।

হতভম্ব শফিক বড় বড় চোখে জিহাদি বইয়ের দিকে তাকাবে। কিন্তু অন্ধকারে বইয়ের নাম পড়তে পারবে না। সে শুকনো গলায় কিছু একটা বলতে যাবে কিন্তু তার আগেই দেখা যাবে র‍্যাবের আরেক সদস্য মেহগনির ফলের মতো লম্বাকৃতির দুটো গ্রেনেড নিয়ে হাজির। সে গলার স্বর কঠিন করে বলবে, স্যার, এর রান্নাঘরে এই ফল দুটো পাওয়া গেছে।

একটু দূরের অন্ধকার থেকে ভেসে আসবে রতনের কণ্ঠস্বর–কী রে শফিক, তোর বউ কি আজকাল গ্রেনেড দিয়ে ভাত রান্ধে।

রতনের কণ্ঠস্বর নিকষ রাতের অন্ধকারে বাদুড়ের ডানা ঝাপটানোর মতো ভয়ঙ্কর আর ভুতুড়ে মনে হবে শফিকের। সে চমকে উঠবে–এই কণ্ঠস্বর সে আগেও বহুবার শুনেছে। কিন্তু অনেকগুলো বন্দুকের নলের মাঝে দাঁড়িয়ে সেই স্বর নির্ণয় করতে ব্যর্থ হবে শফিক। সে রাত্রি কাঁপিয়ে চিৎকার করে বলবে, আমি কোনো খারাপ মানুষ না। আমার বাড়িতে জিহাদি বই নেই, গ্রেনেড নেই। সব সাজানো...। বাক্য শেষ হবে না শফিকের। তার আগেই পেছন থেকে কেউ একজন তার মুখ চেপে ধরবে। ঝটপট বেঁধে ফেলা হবে তার চোখ। টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া যাবে অদূরে দাঁড়ানো জিপের দিকে। নিজেকে নিয়তির কাছে সমর্পণ করতে করতে অসহায় শফিক সবার অলক্ষে কোমরে গুঁজে নেবে তার মোবাইল। শফিকের চিৎকার শুনে তার স্ত্রী কন্যা দৌড়ে বাইরে এসে দেখবে শফিক নেই। কেউ নেই। আছে কেবল পায়ের ধস্তাধস্তির ছাপ আর জিপের ব্যাক লাইটের লাল আলো, যা ক্রমাগত দূরে চলে যাচ্ছে। জাহানারা এলোচুলে লুটিয়ে পড়বে ধূলোয়।

নবগঙ্গার যে বাঁকটা দিনে কি রাতে সব সময় নির্জন থাকে, তার পাশে গিয়ে থামবে র‍্যাবের কালো জিপ। হাত বাঁধা, চোখ বাঁধা, মুখ বাঁধা শফিক বুঝবে না তাকে কোথায় আনা হলো। তখন মাঝ রাত্রি। নির্জনতার কারণেই হয়তো রাতের তিমিরতা খানিকটা ফ্যাকাশে। সেই ফ্যাকাশে রাত্রিরে নবগঙ্গার তীরে কোমরে একটা লাথি দিয়ে শফিককে নামানো হবে। ব্যালেন্স হারিয়ে শফিক মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে কিন্তু তার চোখ-মুখ-হাতের বাঁধন খুলবে না। এবং কোমরে গোঁজা মোবাইল থাকবে স্বস্থানে। এইবার কথা বলবে সেই চেনা কণ্ঠস্বর, মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে যাকে কোনোভাবেই চিহ্নিত করে উঠতে পারবে না শফিক।

তোর নাম কী?

মুখ বাঁধা শফিক জবাব দিতে পারছে না দেখে ওর মুখের বাঁধন খুলে দেবে হাবিব। শফিক লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে বলবে, আমার নাম শফিকুল ইসলাম।

শুধু শফিকুল ইসলাম না। বল গ্রেনেড শফিকুল ইসলাম।

কিন্তু স্যার...

বল শালা!

গ্রেনেড শফিকুল ইসলাম।

বাড়ি কোথায়?

বেলগাছি।

মিথ্যা বলবি না। তোর বাড়ি মধুপুর।

আল্লাহর কসম, আমার বাড়ি বেলগাছি, স্যার। মধুপুরে কোনদিন যাইনি আমি। মধুপুরের নামও কোনদিন শুনিনি।

কোমরে আবার লাথি পড়বে শফিকের। শুয়োরের বাচ্চা, বল আমার বাড়ি মধুপুর।

শফিক ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলবে, আমার বাড়ি মধুপুর।

অস্ত্র ব্যবসার সাথে কতদিন জড়িত?

আপনার পায়ে ধরি স্যার, আমি কোনদিন স্বচক্ষে অস্ত্রশস্ত্র দেখিনি। যা দেখেছি টিভির ভেতর দেখেছি। বিশ্বাস না হলে বেলগাছির লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখেন।

হারামজাদা, তোর বাড়ি তো মধুপুর। বেলগাছির লোকদের কাছে ক্যান তোর চারিত্রিক সার্টিফিকেট নিতে হবে!

স্যার, আমার আসল বাড়ি বেলগাছি। বেলগাছির নবগঙ্গার তীরে আমি বড় হইছি।

চুপ থাক কুত্তার বাচ্চা! নবগঙ্গা তোর পাছার ভেতর হান্দায়ে দেব। গ্রেনেড ছাড়া আর কী কী অস্ত্র আছে বাড়িতে?

আর কিছু নেই, স্যার।

ক্যান, জাহানারা নেই? ওইটাই তো তোর বড় অস্ত্র। যারে পাওয়ার জন্য তুই পুলিশের সাথে ফাইট দিছিলি।

এইসব আপনি কী বলেন! জাহানারারে আপনি কীভাবে চেনেন, স্যার?

শফিকের মুখের ওপর এবার কেজি দশেক ওজনের একটা থাপ্পড় পড়বে–সেইটা পরকালে গিয়ে জাহানারারে জিগাস। ওর নাম আমার সামনে আর নিবি না।

শফিক চড়ের ধাক্কা সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করবে, স্যার, এইটা কোন জায়গা? আমার চোখটা খুলে দেন।

একটু পর যখন আজরাইলের সাথে দেখা হবে, তখন তারে জিগাস কোন জায়গা।

শফিক কাঁদতে কাঁদতে বলবে, আমাকে এখানে ক্যান ধরে আনলেন আপনারা? বিশ্বাস করেন, আমি গ্রেনেড শফিক না। গ্রেনেড শফিক অন্য কেউ। আপনাদের ভুল হচ্ছে। দয়া করে আমাকে আপনারা ছেড়ে দেন। ঘরে আমার একটাই মেয়ে। আমার মেয়েটা যদি জানতে পারে আমাকে আপনারা মারধোর করেছেন, ও খুব কাঁদবে। ওর চোখের জল আমার সহ্য হয় না। আমাকে আমার বউ মেয়ের কাছে ফিরে যেতে দেন। আমার জাহানারা, আমার ফাতেমার কাছে যেতে দেন। দোহাই আপনাদের।

আবার যদি আমার সামনে জাহানারার নাম মুখে আনিস, তোর ওই মুখে পেচ্ছাব করে দেব। তরিকুল, ওর চোখ খুলে দে। মরার আগে হারামজাদাটা রঙ্গিলা দুনিয়া দেখে নিক।

শফিকের চোখ খুলে দেয়া হবে। দীর্ঘক্ষণ বেঁধে রাখার কারণে সে নদীপাড়ের রাত্রিকে ধারণার চেয়েও অন্ধকার দেখবে। দিশেহারা শফিক চিৎকার করে বলবে, আমাকে মারবেন কেন স্যার? স্যার, স্যার আপনার পায়ে ধরি, স্যার। আমাকে জানে মারবেন না। আমি এই এলাকা ছেড়ে অনেক দূরে চলে যাব স্যার। আমাকে শুধু প্রাণে বাঁচায়ে দেন। আজকের পর আপনি এই এলাকায় আমার ছায়াও দেখবেন না। শুধু প্রাণটা ভিক্ষা চাই। কাঁদতে কাঁদতে হাঁটু মুড়ে বসে পড়বে শফিক। শফিকের মিনতি, চোখের জল রতনের হৃদয় গলাতে ব্যর্থ হবে। সে ক্রূর হাসি হেসে বলবে, কিন্তু তোরে বাঁচায়ে দিলে তো আমার চাকরি থাকবে না রে গ্রেনেড শফিক। তুই বড় ভয়ঙ্কর লোক।

শফিক একই রকম চিৎকার করে বলবে, আমি গ্রেনেড শফিক না, স্যার। কোনদিন গ্রেনেড দেখিনি আমি। আপনারা ভুল করে আমাকে ধরে আনছেন।

এ সময় রতনের ইশারায় শফিকের দুই উরুর মাঝে লাথি মারবে তরিকুল। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠবে শফিক। চিত হয়ে পড়ে যাবে সে। রতন হো হো করে

হাসতে হাসতে শফিকের উরুর দিকে ইশারা করে বলবে, গ্রেনেড নেই, ওইটা তবে কী? ওইটাই তোর গ্রেনেড। হাবিব, ওর হাত খুলে দে। মরার আগে নবগঙ্গা থেকে একটা ডুব দিয়ে গ্রেনেডটা ভিজায়ে আনুক শালা। যা, দৌড় লাগা। সামনে নদী।

ঘোলা চোখে শফিক চারপাশে তাকাবে। ধোঁয়া ধোঁয়া অন্ধকার ছড়িয়ে আছে চরাচরে। দূরে ছায়ার মতো একটা শিমুল গাছ দাঁড়িয়ে থাকবে একা। সামনের চেনা নদীটাকে মনে হবে মৃত্যুগহ্বর। এমন এক নিকষ অন্ধকার রাতে প্রিয় নবগঙ্গার তীরে স্বজনহীন অবস্থায় তার মৃত্যু হবে, কে ভেবেছিল!

এ সময় কালো দৈত্যরা জটলা পাকিয়ে কিসের যেন সলা করবে। শফিক এটাকেই সুযোগ মনে করে দৌড় দেবে নদীর দিকে। তার চোখ ভর্তি পানি, নাক ভর্তি সর্দি আর বুক ভর্তি আতঙ্ক। শৈশব ফেলে আসার পর এই প্রথম সে শিশুদের মতো কাঁদবে। প্রতিটি নিশ্বাসকে শেষ নিশ্বাস ভেবে সে দিকশূন্যের মতো দৌড়বে। তার কণ্ঠের গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসবে হাউমাউ কান্না। আর ঠিক তখন দীর্ঘ সময়ের শ্বাসরুদ্ধ প্রচেষ্টার পর আব্বুর মোবাইলে কল ঢোকাতে সক্ষম হবে শফিকের কন্যা ফাতেমা। কোমরে গোঁজা ফোন পেটের ঘর্ষণে রিসিভ হয়ে কথা বলা শুরু করবে। দানবঘেরা এই স্বজনহীন প্রান্তরে অমৃতের মতো ভেসে আসবে ফাতেমার কণ্ঠস্বর। মৃত্যুপরোয়ানা ঠোঁটে নিয়ে দৌড়তে থাকা শফিক হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলবে, মারে, ওরা আমাকে মেরে ফেলবে রে মা!

শফিকের কান্নারুদ্ধ কণ্ঠের এই ছেঁড়া ছেঁড়া সংলাপ ওপাশ থেকে পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারবে না ফাতেমা। বাবার অবাধ্য কান্নার প্রেক্ষিতে সে কেবল একটা কথাই চিৎকার দিয়ে বারবার বলবে, আব্বু, তোমার কী হইছে? তুমি কান্না করতেছ যে!

এ সময় বাতাসে শিস কেটে ছুটে আসা একটি বুলেট শফিকের মাথাটাকে বিচূর্ণ করে দেবে। বুলেটের আওয়াজ ওপাশে কান্নারত ফাতেমার কাছে পৌঁছবে কি পৌঁছবে না লোকেরা কখনো জানতে পারবে না। কারণ, এই ঘটনার পর ফাতেমা আর কোনদিন কথা বলবে না।

সন্ধ্যা হয় হয় মুহূর্তে শেষ হয় এক জাহান্নামির গল্প। আমি কোটরাগত চোখে তাকিয়ে থাকি গল্পকথক আমাদের প্রিয় ইমাম সাহেবের গম্ভীর চেহারার দিকে। গল্পের ঘোরে আমি ক্ষণকালের জন্য ভুলে যাই আমার নাম শফিকুল ইসলাম এবং আমার মা অনাগত নাতনির নাম রাখতে চায় ফাতেমা। আমার দুই বন্ধু শিবলী ও নাইম এমন বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে, যেন আমি মানুষ নই,

ট্রেনে কাটা এক জ্যান্ত লাশ। এ সময় রমজানের গজল থেমে মসজিদের মাইকে মাগরিবের আজান শুরু হয়। আজানের ধ্বনিতে ইফতারের পবিত্র মুহূর্ত শুরু হয়ে যায় অথচ আমি পাথুরে মূর্তির মতো নবগঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে থাকি। আজ আমি আজানের ভেতর কেবল একটি বাক্যই ধ্বনিত হতে শুনি–আব্বু, তুমি কান্না করতেছ যে!

আব্বু, তুমি কান্না করতেছ যে!

রচনাকাল : ৩১ মার্চ, ২০১৯

ভেড়ামারা থেকে যে বৃদ্ধ আমাদের সহযাত্রী হতে বাসে উঠলেন, তার দিকে সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। পোশাকে-আশাকে-চেহারায় তিনি আর দশজন স্বাভাবিক বৃদ্ধের মতোই দেখতে। মাথায় জালি টুপি। গায়ে ঘিয়ে রঙের পাঞ্জাবি। হাতে কাপড়ের ছোট্ট ব্যাগ। পরনে কী, শুরুতে খেয়াল করতে পারিনি। হতে পারে মুরব্বিদের প্রিয় ঢোলা সাদা পায়জামা। ধূসর রঙের প্যান্টও হতে পারে। খুব পরিচ্ছন্ন নয় আবার খুব ময়লাও নয়। বয়সের মতো তার পোশাকও পুরনো। তার দিকে আমাদের অবাক হয়ে তাকানোর কারণ তার পোশাক কিংবা চেহারা নয়; তার কথা। বাসের পাদানিতে পা রেখে, ইঞ্জিন কভারে বাঁ হাতের ঠেস দিতে দিতে তিনি উচ্চ গলায় বললেন, আপনেরা কেউ পোধানমন্ত্রীর সাতে আমাক দেখা করায় দিতি পারবেন?

বাসে উঠেই বৃদ্ধের হেঁকে ওঠা এবং পোশাক দেখে ভেবেছিলাম আশপাশের নির্মাণাধীন কোনো মসজিদের মুয়াজ্জিন কিংবা খাদেম হবেন তিনি। এই ধারণার পেছনে রয়েছে আমার পূর্বাভিজ্ঞতা। ভেড়ামারা হয়ে ঢাকা যাওয়ার এই রুট আমার খুবই চেনা। প্রায়ই দেখি, কাউন্টারে বাস থামলে হুজুর চেহারার কেউ নির্মাণাধীন মসজিদের জন্য দান গ্রহণ করতে আসেন। তাদের কারো হাতে থাকে রশিদ, কারো হাতে টিনের কৌটা। খুচরা টাকা থাকলে আমি প্রায় সময়ই শরিক হওয়ার চেষ্টা করি। দানের এই টাকা জায়গা মতো পৌঁছনোর সংশয় মনে জাগলেও পাত্তা দিই না। আজকের এই বৃদ্ধের মতো তারা বাসের পাদানিতে পা রেখেই দানের ফজিলত বর্ণনায় হাঁক ছেড়ে ওঠেন। ফজিলতের বদলে এই বৃদ্ধের মুখ থেকে যখন প্রধানমন্ত্রীর আঞ্চলিক শব্দ উচ্চারিত হয়, তখন নড়েচড়ে বসতেই হয়। খেয়াল করি, আমার মতো নড়েচড়ে উঠেছে আরো অনেকে, যাদের কানে ইয়ারফোন গোঁজা নেই।

একজন যাত্রী ঢাকাগামী পরিবহনে উঠে সবার আগে যা খোঁজে, তার নাম সিট। যারা অভিজ্ঞ, নিয়মিত যাতায়াতে অভ্যস্ত, তারা টিকেটের সিট নম্বর দেখে সোজা গিয়ে আসন গ্রহণ করে। আর অনভ্যস্তরা সিট খুঁজতে সুপারভাইজারের সহযোগিতা নেয়। কিন্তু এই বৃদ্ধের সিট নিয়ে কোনো আগ্রহ নেই। তার আগ্রহের সবটুকু

জুড়ে আছেন প্রধানমন্ত্রী। ইতোমধ্যে তিনি আরো পাঁচবার উচ্চারণ করে ফেলেছেন আমাদেরকে অবাক করে দেয়া সেই বাক্যটা–আপনেরা কেউ পোধানমন্ত্রীর সাতে আমাক দেখা করায় দিতি পারবেন?

বৃদ্ধের প্রশ্নের জবাব দিতে কাউকে আগ্রহী হয়ে উঠতে দেখি না। বরং সবাইকে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখি তার ঝুলে পড়া দাড়ির দিকে। সুপারভাইজার এগিয়ে আসেন। বলেন, মুরব্বি, কই যাবেন?

প্রধানমন্ত্রীর বৃত্ত থেকে মুরব্বি বের হতে পারেন না। বলেন, পোধানমন্ত্রীর কাছে যাব।

রসিক সুপারভাইজার গোঁফের নিচে হাসি লুকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, প্রধানমন্ত্রী আপনের কী হয়?

বৃদ্ধ ভাবলেশহীনভাবে বলেন, পোধানমন্ত্রী হয়।

আচ্ছা, আপনের টিকিট দেখান? কোন সিট আপনের? সুপারভাইজারের হাসি এবার গোঁফের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

বৃদ্ধ পাঞ্জাবির বুক পকেট থেকে নীরবে টিকেট বের করে দেন।

সুপারভাইজার টিকেটে চোখ বোলায় আর আমি ভেতরে ভেতরে শঙ্কিত হয়ে উঠি। শঙ্কার কারণ, আমার ডানপাশের সিটটা খালি। কুষ্টিয়া থেকে যখন সিটটা খালি রেখে বাস চলতে আরম্ভ করেছিল, সুপারভাইজারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম পাশের সিটের যাত্রী সম্পর্কে। যাত্রী কি নাই নাকি সামনের কোনো স্টপেজ থেকে উঠবে? সুপারভাইজার জানিয়েছিলেন–ওই সিট ভেড়ামারার এক যাত্রীর। তখন আমার ভেতরটা আপন মনে বলে উঠেছিল, যেন কোনো এক রূপসী তরুণী আমার সহযাত্রী হয়।

কুষ্টিয়া থেকে গাড়ি চলতে আরম্ভ করলে নানা ভাবনার জাল বুনেছি। মায়ের কথা ভেবেছি। বাবার কথা ভেবেছি। উঠোনে লাগানো মায়ের প্রিয় লাউগাছ, সবার অলক্ষে যে রয়না গাছে চড়ে বসেছে, তার কথা ভেবেছি। এইসব ভাবনার ভেতর প্রত্যাশিত সহযাত্রী তরুণীর কথা একবারের জন্যও মন থেকে সরে যায়নি। কামনার দেয়াল ঘড়িতে টিকটিক কাঁটা ঘুরেছে–পাশের সিটের স্বত্ব নিশ্চয় কোনো রূপসী কিনে নিয়েছে। সে হয়তো এতক্ষণে নির্ধারিত স্টপেজে টিকেট হাতে দাঁড়িয়ে কানের পাশে চুল গুঁজছে আর হাতঘড়ি দেখছে।

সুপারভাইজার নির্বিকার ভঙ্গিতে আমার পাশের সিটের দিকে ইশারা করেন বৃদ্ধকে–ওই তো আপনের সিট। D-2। যান। বসেন।

প্রত্যাশার পাপ হয়তো বেশি হয়েছিল, তাই এই শাস্তি। প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ-প্রত্যাশী একজন আধাপাগল বৃদ্ধের সাথে প্রায় তিনশ কিলোমিটার পথ ভ্রমণ কেমন হবে ভাবতেই গা গুলিয়ে উঠছে। বিরক্তি চেপে জানলায় চোখ ছড়িয়ে দিলাম।